‘এখনও এখনও যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই’

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

গুজরাতের সাম্প্রতিক কান্ড নিয়ে এত লেখা হয়েছে, এত ছবি ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে, ভয় হয়, যা-ই লিখি, পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে। অন্তত কিছু পাঠকের কাছে এ লেখার কোনো অংশ সেইরকমই মনে হতে পারে।

ঠিক কী ঘটেছিল এবং তীব্রতা অনেক কমে গেলেও, এখনও মে মাসের শেষেও কী ঘটে চলেছে গুজরাতে?

ধর্মভিত্তিক দাঙ্গা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এদেশে এমন দাঙ্গার বয়স প্রায় দেড় থেকে দুশ বছর। আমরা, ভারতীয়রা শুধু ইতিহাস-বিস্মৃত নই, ইতিহাস-ভীও। সেই জন্যেই ইতিহাস যে-সত্যের সংবাদ দেয় তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে যেটুকু শেখা দরকার, যেটুকু গ্রহণ ও বর্জন করা প্রয়োজন তা করতে পারি না। এবং ভীরা যা করে আমরাও ঠিক তাই করি। নিজের কাঁধ থেকে দায়টা সরিয়ে দিই অন্যের কাঁধে। এদেশে দাঙ্গার দায় একসময়ে নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দেওয়া হত ব্রিটিশদের ওপরে। সন্দেহ নেই সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে তারা মানুষকে নানাভাবে ভাগ করে ফেলতে চাইত এবং করে ফেলতও। আরবে বা আফ্রিকায় সে-ভাগের মুখ্য ভিত্তি ছিল জাতিগোষ্ঠী ও ট্রাইব। এদেশে ধর্ম প্রধানত মানুষকে ভাগ করে দিয়ে শাসন করার এই নীতি সফল করতে এদেশের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। তাদের লেখা নতুন ইতিহাসে প্রাচীন যুগ হয়ে উঠেছিল হিন্দু শাসনের স্বর্ণযুগ। মধ্য পর্যায়ের মুঘল যুগ চিহ্নিত হয়েছিল অন্ধকার যুগ বলে। সেই ইতিহাস পড়ে ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মনে ভাবনার কোন রঙের মেঘ জমতে পারে তা সহজেই আঁচ করা যায়। সে মেঘের একটিমাত্র দৃষ্টান্তেই তার চরিত্র বোঝাও যাবে। সেই মেঘই তো ছিল নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় ও বুকে, যখন তিনি ‘ভারতে যবন’ (১৮৭৪) লেখেন। সে নাটকে ‘মুসলমানদের নানা অত্যাচারের ছবি আঁকা হয়েছে। ভারতলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, ‘যতদিন আর্য সন্তানগণ পূণ্যভূমি হতে যবনগণকে দূরীভূত করতে না পারবে ততদিন অবধি প্রিয় ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্যসন্তানগণের নিকট হতে বিদায় হলেম।’

আবার এসবের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান মনে কোন স্রোত প্রবাহিত হত তা অনুমান করাও কঠিন নয়। ফলে বিটিশ আমলে মাঝারি বা বড় কোনো আকারে দাঙ্গা লেগেই থাকত, প্রায় বিরামহীন।

কিন্তু সব পাপই কি ইংরেজের? আমাদের, ভারতীয় কোনো ভাগ নেই তাতে? ইংরেজ চলে যাওয়ায় অর্ধ শতাব্দী পরেও কেন তবে গুজরাট ঘটে? স্বাধীন ভারতে কেন খোদ রাজধানীতে নির্মম শিখ নিধন ঘটে যায়? ইংরেজ আমলে কখনও দিল্লি বা গুজরাতের মতো ‘পোগ্রাম’ ঘটেছে বলে জানা যায় না। এই পাপে আমাদেরও কোনো অংশ আছে নিশ্চয়ই! আর তাই স্বাধীনতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে ধর্মীয় অসহনশীলতা, হাঙ্গামা, দাঙ্গা এবং আক্রমণ। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের পর সপ্তাহ গুজরাতে যা ঘটে চলেছে তা-ই এ কথার সাক্ষ্য।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ গোধরায় ঠিক কি ঘটেছিল, কারা ঘটিয়েছিল তা নিয়ে তর্ক এখনও শেষ হয়নি। নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তবে সে তদন্ত কোনওদিন শেষ হবে না কিনা হলেও প্রকৃত সত্য জানা যাবে কিনা তা কেউ জানে না। এর মধ্যেই গোধরাকাণ্ডের একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়েছে বিজেপি-কংগ্রেস ভোট রাজনীতির মত্তহস্তী। এমন পরিস্থিতিতে সত্যেরা সাধারণত মুখ দেখায় না। অতএব .....

যেটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে তা হল — ওইদিন সকালে অযোধ্যা থেকে আসা সবরমতি এক্সপ্রেস স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়। ৫৮ জন নিরীহ মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী ও শিশু। কয়েকজন কর সেবকও ছিল।

কারা ঘটাল এমন ভয়ংকর ও নৃশংস কাণ্ড? কেন ঘটাল? কেমন করে ঘটাতে পারল?

এইসব ভয়ানক জরি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। পাওয়া হয়ত প্রায় অসম্ভবই!

কেন্দ্রীয় সরকারের কেউ কেউ, ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলেন, সবই আইএসআই-এর কাজ। আজকাল প্রায় সব অপরাধের ব্যাখ্যাই আই এস আই দিয়ে করা হয়। এ প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, কাণ্ডটা ঘটিয়েছে গোধরার মুসলমান জনতা। গোধরা এমনিতে খুব দাঙ্গাপ্রবণ। প্রায় সমান সমান সংখ্যাক হিন্দু-মুসলমানের গঞ্জ-শহর গোধরার প্র

ায় প্রত্যেক বছর অন্তত একবার দাঙ্গা বাধে। ফলে দু-পক্ষই প্রায় সর্বদাই তৈরী থাকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা অথবা উভয়ের জন্যে। সুতরাং আগুন জ্বালার পেট্রল বা নির্মম হাতের অভাব হয়নি।

সবরমতি-অযোধ্যা এক্সপ্রেসে বছরভরই করসেবকদের যাতায়াত। গোধরাস্থ স্টেশনে এবং রেললাইনের দুধারে গরিব মুসলমানদের বস্তির মানুষকে তাদের লাঞ্ছনায় জ্বলতে হয় প্রায় নিয়মিত। ২৭ ফেব্রুয়ারীও তারা স্টেশনের মুসলমান হকারদের কাছ থেকে খাবারদাবার, জিনিসপত্র নিয়ে দাম না দিয়েই ট্রেনে উঠে পড়ছিল। দোকানীরা প্রতিবাদ করতেই মারধর হয়, হাঙ্গামা বাধে। এক দোকানীর মেয়ে নাকী বাবাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। করসেবকদের কেউ মেয়েটিকে নাকি ট্রেনে তুলে নেয়। বাবা হাহাকার করে ওঠেন। মিনিট কয়েক পর দূরে ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অগ্নিকাণ্ড। আটান্নজনের নির্মম মৃত্যু। তারপরই জ্বলে ওঠে গুজরাত। এখনও জ্বলছে।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও শোনা যায়। আর এস এসের সংগঠিত দাঙ্গাবাজরাই 'গোধরা' ঘটিয়েছে। বৃহৎ ও ভয়ংকর এক পরিকল্পনারই অঙ্গ এটি। সমগ্র গুজরাত জুড়ে সংখ্যাগু সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের হাতে সংখ্যালঘুর গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা (একেই বলা হয় 'পোগ্রোম') ঘটাবার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছিল বছরখানেক ধরেই। তা শু করার জন্যে একটা উপলক্ষ্য প্রয়োজন ছিল। গোধরা সেই উপলক্ষ্য। হিটলার বাহিনী যেমন ইহুদি ও কমিউনিস্টদের বিদ্ধে পোগ্রোম শু করার উপলক্ষ পাওয়ার জন্যে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল জার্মানীর পার্লামেন্ট ভবন রাইখস্ট্যাগে।

এ ব্যাখ্যার সত্যাসত্য বিচারে না গিয়েও গুজরাতকাণ্ডের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তার একটি হল, এমন কাণ্ড ক্রোধ বা ঘৃণার স্বতস্ফূর্ত ও অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী মোদী যতই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের আশ্রয় নিয়ে বলুন, 'এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইট্স রিঅ্যাকশন, অপোজিট অ্যান্ড ইকোয়াল'। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানী যতই বলুন, গোধরা না ঘটলে গুজরাত কাণ্ডের চরিত্র, তারা নন বৈশিষ্ট্য চিৎকার ডেকে ডেকে বলছে, যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, গুজরাত হত্যালীলা গোধরার ক্রুদ্ধ পতিক্রিয়া নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি। একেবারে অন্য কিছু। আগে থেকে ছক কষা সুপরিকল্পিত কিছু। শ ভাষায় যার নাম 'পোগ্রোম', এবার তা এসে গেল এদেশের বিভিন্ন ভাষাতেও। কী সেইসব বৈশিষ্ট্য?

এক, একটা ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, সে ঘটনা যত নৃশংস ও ভয়ংকরই হোক, কতদিন ধরে চলতে পারে? দুদিন? সাতদিন? পনেরো দিন? তিনমাস ধরে চলে নাকি, 'স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া'? 'গুজরাট' যে সুপরিকল্পিত, বিহিন্দু পরিষদ নেতৃত্বই তার সাক্ষী। ছিয়ানববই বছরের পণ্ডিত, মহাভারত বিশেষজ্ঞ, শ্রদ্ধেয় গুজরাতি ব্যাক্তিত্ব, অধ্যাপক কেশবরাম কাশীরাম শাস্ত্রী ভিএইচপি-র গুজরাত রাজ্য শাখার সভাপতি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, 'সকালবেলা (২৮ ফেব্রুয়ারী) বসে আমরা তালিকা তৈরি করি' (রিডিফ ডট কম)। কিসের তালিকা? মুসলমানদের দোকানপাট, ব্যবসাস্থল, ঘরবাড়ি, বাসস্থানের তালিকা। এই তালিকা তৈরি করতে ভোটার তালিকা কর্পোরেশনের ট্যাক্সের বিবরণের কাগজপত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। কমপিউটার ব্যবহার করা হয়। আক্রমণকারী গ্রুপ তৈরি করে তাদের নেতার হাতে তালিকা তুলে দেওয়া হয়। তালিকা মিলিয়ে আঠাশেই শু হয়ে পোগ্রোম। আমেদাবাদ যেন বার্লিন। ঠান্ডা মাথায় সংগঠিত এমন ভয়ংকর কান্ডকে কি কোনো মতে বলা যায় 'আক্রান্ত হিন্দুত্বের প্রচন্ড ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ?'

দুই, শুধু আমেদাবাদ নয়, আঠাশেই অ্যাকশন শু হয়ে যায় মুম্বাই-আমেদাবাদ দীর্ঘ হাইওয়েতে। দূর দূর শহরে, গঞ্জে এমনকি গ্রামেও। সেসব জায়গায় তখনও গোধরার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছায়নি, অত দ্রুত পৌঁছনো সম্ভবই নয়। কাজেই এ কাণ্ড গোধরার প্রতিক্রিয়া, না সুদৃঢ় প্রত্যয়ী এক কেন্দ্রের নির্দেশে পরিচালিত রাজ্যব্যাপী সুপরিকল্পিত পোগ্রোম?

তিন, এই আক্রমণে আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। যে কোনো দাঙ্গায় সাধারণত মারা পড়ে গরিবরাই। ধনীদের গায়ে আঁচ লাগে না। গুজরাতে পোগ্রোমে গরিবদের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত এলাকার ধনী মুসলমানরাও ডজনে ডজনে নিহত হয়েছে। তাঁদের নারীরা ধর্ষিতা হয়েছেন, তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। এমন একটি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ঘটনা এখন সকলেরই জানা। তিনি কংগ্রেসে প্রাক্তন এম. পি.। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাঁদের কাছে টেলিফোনে বারবার আবেদন করেও তিনি ফল পাননি। তাঁর বিশাল বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ও তাঁর পরিবারের বাকি সতেরোজন আগুনে ভাজা ভাজা হয়ে মারা যান।

চার, এবার গুজরাতের ঘটনার একটি অর্থনৈতিক দিক চোখে পড়বেই। বেছে বেছে বিশেষভাবে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধবংস করা হয়েছে মুসলমানদের ব্যবসা। বিভিন্ন শহরে-গঞ্জে ঘটেছে একই ব্যাপারে। মুম্বাই-আমেদাবাদে হাইওয়েতে তাঁদের প্রায় পাঁচশো ধাবা লুণ্ঠন ও ধবংস হয়েছে, পরে 'পুনর্বাসনে' সে সব নিশ্চয়ই 'হাতবদল' হয়ে যাবে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, মুসলমানদের ব্যবসা পত্র দখল করে নেওয়া এই পোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। পাঁচ, পোগ্রামে বা দাঙ্গায় সাধারণত অংশ নেয় সমাজের তলদেশের মানুষ, গরিব লুম্পেনরা। এবার গুজরাতে আক্রান্তদের মতোই আক্রমণকারীদেরও চেহারায় একটা বদল দেখা গেছে। মধ্যবিত্ত, এমনকি পোগ্রামে যা আগে কখনও কোথাও দেখা যায়নি। এদের অনেকেই দামি গাড়ি নিয়ে এসেছে। 'কাজে' হাত লাগিয়েছে। লুঠের মাল গাড়িতে তুলে জায়গা মতো পৌঁছে গেছে।

ছয়, গুজরাতের পোগ্রোমে খরচ হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এ পোগ্রোম যেমন পরিকল্পিত তেমনই অসম্ভব ব্যয়বহুল। বহু জায়গায় অগ্নিসংযোগের জন্যে গ্যালন গ্যালন পেট্রোলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে শত শত গ্যাস সিলিন্ডার। মসজিদ বা বড় বাড়ি উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চমানের বিস্ফোরক। বাইরে থেকে, শহরের এক প্রান্তে লোক আনতে, লুঠের মাল সরাতে, মাদ্রাসা, মসজিদ ও ঘরবাড়ির ধবংসাবশেষ সরিয়ে ফেলতে অসংখ্য প্রাইভেট গাড়ি, ম্যাটাডোর, বড় বড় লরি ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়েছে। এসবের খরচ তো কম নয়। তার ওপর টাকা দিয়ে মদ দিয়ে আক্রমণে লাগানো হয়েছে গরিব, ঝোপড়পট্টির বাসিন্দা বহু হরিজনকে। এত টাকা কারা জোগাল, কেন জোগাল, এ প্রশ্ন খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সাত, রাজ্য সরকারের প্রশাসন, পুলিশ এবং পৌরসভা শুধু পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন আক্রমণকারীদের। খবর পেয়েও পুলিশ আসেনি।

এলেও আক্রান্তকে সাহায্য করেনি; অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছে। কোথাও কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অসহায় নারী-পুষ-শিশুকে তুলে দিয়েছে উন্মত্ত জনতার হাতে।

কোনো কোনো মন্ত্রী দিনরাত বসে থেকেছেন পুলিশ কন্ট্রোল মে। কোনো বিবেকবান, আইনভক্ত আফিসার ব্যবস্থা নিতে গেলেই তাঁদের হাত চেপে ধরেছেন। চোখের সামনে আইনকে ধর্ষিত হতে দেখে, অসহায় মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে দেখেও কিছু করতে না পারার গ্লানিতে ও ঘৃণায় বেশ কয়েকজন প্রবীণ আই এ এস অফিসার পদত্যাগ করেছেন। এমন কান্ড দেশের কোথাও কোনো দাঙ্গাতে এর আগে ঘটেনি। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হর্ষ মান্দার। তিনি পদত্যাগ করে সরাসরি নেমেছেন প্রতিরোধ, প্রতিকারে। তাঁর লেখা বই থেকেই ('ত্রাই, মাই বিলাভেড কান্ট্রি') বিশ্ববাসী জানতে পেরেছেন, সত্যিই কী ঘটেছে গুজরাতে। তিনি জানিয়েছেন ভবনগরের ডি-এস-পি রাহুল শর্মা, পাটন-এর ডি-এস-পি রাজীব রঞ্জন কিংবা কচ্ছের এস-পি বিবেক শ্রীবাস্তবের মতো আই-পি-এস অফিসাররা বিবেক অনুযায়ী কাজ করায়, অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোয়, দৃঢ় হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করায় এবং দাঙ্গাবাজদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করার 'অপরাধে' কীভাবে নিরামিষ জায়গায় ট্রান্সফার হয়েছেন। কীভাবে তাঁদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা, মসজিদ, ঘর বাড়ি ধ্বংস করতে এবং আগুনে পোড়ার পর ধ্বংসস্তূপ সরাতে ব্যবহৃত হয়েছে বহু বুলডোজার। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কোথাও রাতারাতি রাস্তা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সে কাজে রোড রোলার ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও অস্থায়ী মন্দির বানিয়ে কোনো দেবতার মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে 'বাবরি স্টাইল'।

অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণে যে মানুষ পথে নামে তারা কোথায় পায় বুলডোজার, রোলার, লরি, প্রাইভেট গাড়ি, গ্যাসসিলিন্ডার, মুসলমান বাসিন্দার ঠিকানার তালিকা, তাদের বাসস্থানের ঠিকানার বিবরণ? সুশৃঙ্খল, চমৎকার এবং বহুদিন ধরে তৈরি করা পরিকল্পনা ছাড়া এমন ঘটে না, ঘটতে পারে না।

আট ঘাট, পরিকল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। তোড়জোড় টের পেয়ে ভয় পেয়েছিল বহু মুসলমান ব্যবসায়ী। তাঁরা বাঁচার জন্য একটা কৌশল করেছিলেন। দোকানপাট, ব্যবসাসংস্থার নাম পালটে দিচ্ছিলেন। ব্যবসাতে নামের 'গুডউইল' একটা বড় ব্যাপার। তবু, বাপ-ঠাকুর্দার আমলের 'ইসমাইল স্টোর্স' সাইনবোর্ড বদলে রাতারাতি হয়ে যাচ্ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ ভান্ডার'। বাঁচার জন্য মানুষ কী না করে! কিন্তু মৌলবাদীদের হাত থেকে অত সহজে বাঁচা যায় না। দুটি গুজরাতি সংবাদপত্র 'গুজরাত সমাচার' এবং 'সন্দেশ' বছর খানেক ধরে এইভাবে বদলে যাওয়া সাইনবোর্ডের আসল নামের তালিকা ছেপে যাচ্ছিল। টার্গেটের তালিকা তৈরি হচ্ছিল। তখন কোথায় গোধরা? কোথায় ভস্মীভূত দুই বগি? এই তালিকাই তো মহাপন্ডিত শাস্ত্রীজিরা তৈরি করেছিলেন গোধরার পরের সকালে!

নয়, গুজরাতের সবচেয়ে ভয়ংকর বৈশিষ্ট্য পোগ্রোমে অসংখ্য মানুষের, হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ। সমাজের নানাশ্রেণী ও স্তরের মানুষের। এত মানুষ গুণ্ডা হতে পারে না, দুষ্কৃতি বা সমাজবিরোধী হতে পারে না। এদের মধ্যে সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষও আছেন, অনেক। তবু তাঁরা নেমে গেছেন পথে। এই 'নেমে পড়া'কেই ভি এইচপি নেতা বলেছেন 'হিন্দু জাগরণ'। এই জাগরণই তিনি ঘটাতে চান ভারত জুড়ে। তিনি বলেছেন সমগ্র ভারতকে তাঁরা গুজরাত বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হবেন।

বহুদিন ধরেই হিন্দুত্বের নামে মানুষের মগজ ধোলাই হচ্ছে। হিন্দুত্বের নামে হীনতর প্রবৃত্তির কাছে ঘৃণা, ভয়, লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ-এর কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে। ঠিক এই কাজটাই করে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ। এ আবেদন হৃদয় ও মস্তিষ্কে একবার ঢুকে গেলে একটি সৎ যুবক অনায়াসে নাথুরাম গড্‌সে হয়ে যায়। শহিদের অহংকারে হাসিমুখে উঠে যায় ফাঁসির মঞ্চে। ঘৃণায় অন্ধ হয়ে ধর্ষণ করে কোনো পবিত্র নারীকে। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে হত্যা করে। মৌলবাদী আবেদন ধর্মের নামে তাকে বিচারবুদ্ধিরহিত এক অন্ধজীবনে পরিণত করে। তখন তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেওয়া যায়। গুজরাতে হাজার হাজার মানুষের মগজ ধোলাই করে তাদের দিয়ে ঠিক তাই করিয়ে নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

হিন্দুত্বের নামে এই মৌলবাদী মগজ ধোলাই-এর কাজ গত এক যুগ ধরে চলছে। পশ্চিম গুজরাতেরই সমুদ্র তীরের সোমনাথ মন্দির থেকে একদিন আদবানীজির রথ রওনা হয়েছিল পূর্বে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের দিকে। ভারতের বুক চিরে হিন্দুত্বের নামে সে রামরথ ধর্মীয় ঘৃণা আর বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে গিয়েছিল। বিজেপি শাসনের সারা দেশে বিশেষিত গুজরাতে মগজ ধোলাই চলছে ইতিহাসই বদলে দিয়ে। শেখানো হচ্ছে, হিটলার বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন। সে দেশের সংখ্যালঘু ইহুদিদের বিদ্ধে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ জার্মানিকে, জার্মানির জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল।

নাৎসিরা বলত, খাঁটি জার্মানদের গর্ববোধ করা উচিত আর্য বলে। আর এস এস শেখাচ্ছে 'গরব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়।' নাৎসিরা বলত, জার্মানির সব দুর্দশার জন্যে দায়ি ইহুদিরা। আমাদের মূল্যে ব্যাটারা কত বেড়েছে দেখ! আরএসএস বলছে, খুব বেড়েছে এরা, বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওদের অনেক বড় করা হয়েছে। দেশের স্বার্থের ওদের ছাঁটতে হবে। এদেশে থাকতে হলে হিন্দুত্ব মেনে নিয়েই থাকতে হবে ওদের। একেই বলে মিলেমিশে থাকা! গোয়াতে জনসভায় সেই কথাই বলেছেন বাজপেয়িজি। আরএসএস যাঁর 'আত্মা'। আর সেই কথাই বলেছে এরএসএস তাদের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে।

পাঠক, একবারও ভাববেন না গুজরাত শুধু গুজরাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মগজ ধোলাইয়ের কাজ, হিন্দুত্বের নামে ঘৃণার অভিযান চলছে সারা দেশ জুড়ে। আপনার পাড়াতেও। একান্তে ডেকে প্রাণ খুলে কথা বলে দেখুন, আপনার প্রতিবেশীদের, এমনকী আপনার পরিবারেরও দশজনের মধ্যে অন্তত চারজন ওই ভাষাতেই কথা বলবে, 'সত্যি, খুব বেড়েছে ব্যাটারা!' একটু শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল ওদের!' মগজ ধোলাই-এর কাজ চলছে সারা দেশ জুড়ে। আপনার পাড়াতেও চলছে, আপনার বাড়িতেও। অজান্তেই চলছে, এমনকী যাদের মগজ ধোলাই হয়ে যাচ্ছে তাদেরও অজান্তেই চলছে। কিন্তু চলছে। দিনরাত, অবিরাম চলছে। এই চলার জোরেই ওরা বলতে পারে, সারা ভারতকে গুজরাত করে দেব!

যদি ওরা বেঁচে যায়, যদি ওরা পেরে যায় এদেশকে গুজরাত করে দিতে, ভারত আর ভারত থাকবে না। হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের মৌলবাদী অভিযানের চাকার নিচে গুঁড়িয়ে যাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই ভারতবর্ষ। নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির বহুমুখী বৈচিত্র্য না থাকলে এদেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হতে হতে ফিরে যাবে আলকজান্ডারের কালে। খণ্ড খণ্ড সেই দেশ কি হতে পারে ভারতবর্ষ? হতে পারে আমাদের মাতৃভূমি?

এসব কথা নিতান্তই রাজনীতির কচকচানি বলে ভাবতে পারেন আপনি, ভেবে মনকে শান্ত থাকার উপদেশও দিতে পারেন। গুজরাতের ধর্ষিত শরীর থেকে চোখ

ফিরিয়ে নিয়ে বলতে পারেন, 'শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান / চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান, / বলব বৎস, সভ্যতা যেন থাকে বজায়!'

এতে আপনার মনে আপাতত শান্তি বিরাজ করতে পারে। কিন্তু ওরা যদি বেঁচে যায়? ওরা যদি পেরে যায় ভারতকে গুজরাত করে দিতে? তা হলে আজ গুজরাত যেভাবে ধর্ষিত হবে, সেদিন তাদের রক্ষা করা দূরের কথা, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না কেউ। কারণ, তাকাবার মতো কেউ আর বাকি থাকবে না।

ভাববেন না, হিন্দু বলেই আপনি পার পেয়ে যাবেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ধর্মীয় আইন মানছে না, এই অজুহাতে আফগানিস্তানে মুসলমান তালিবানরা কাদের মারছিস? মুসলমানদের! মৌলবাদের স্বভাবই এমন। বাইরের শত্রু শেষ হয়ে গেলে, বা হাতের কাছে না পেলে, সে নিজের ঘরের ভেতর থেকে একজন শত্রু খুঁজে নেয়। একজন না একজন শত্রু তার চাই-ই, নইলে সে প্রাণে বাঁচে না। সে বাঁচলে আপনি বাঁচবেন না। আজ বেঁচে গেলেও কাল বাঁচবেন না। সুতরাং সাধু সাবধান!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com